আজকের কাগজ

তারিখ ... 23.JUN 1996 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

কেজি স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি

১৯৮০ সালের পূর্বে দেশে অল্পসংখ্যক কেজি স্কুল ছিলো। তখন ছোট ছেলে মেয়েরা সরকারি প্রাথমিক স্কুলেই প্রথম অক্ষর জ্ঞান শিখে। একটি শিশুর বয়স তখন কমপক্ষে ৬ বছর হলে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হতো। তখন তাকে পড়ানো হতো আদর্শ লিপি। এভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। লেখাপড়া শিখে তখনকার ছাত্র-ছাত্রিরা বর্তমান ছাত্রদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলো না বরং বর্তমান ছাত্রদের চেয়ে তারা বেশি মেধাবী হয়েছিলো। ১৯৮০ সালের পর দেশে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। তখন শিক্ষিত বেকাররা আয়ের উৎস হিসেবে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতো। তার মধ্যে কেজি স্কুল ও কোচিং সেন্টার অন্যতম। আমি এখানে শুধু কেজি স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১৯৮০ সালের পর দেশের বড় বড় শহরগুলোতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবিদার কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৮৫ সালে তা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ১৯৯০ সাল থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো শহরের প্রতি মহল্লায় কেজি স্কুল গড়ে ওঠে যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

কেজি স্কুলের যিনি প্রধান তাকে অধ্যক্ষ বলে। তার শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে না। অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো- এসএসসি থেকে শুরু করে বিএ-বিএসসি। সব শিক্ষকই বেকার। যিনি অধ্যক্ষ তিনিই বিদ্যালয়ের মালিক বা প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলের সম্পূর্ণ আয়-ব্যয় তার হাতেই। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন প্রত্যেককে দেয়া হয় না। কিছু সংখ্যক শিক্ষককে, বেতন দিলেও ৬/৭শ' টাকার উপরে নয়। এদের শিক্ষক নিয়োগের সময় শর্ত থাকে যে, "বেতন দিতে পারবো না তবে টিউশনি পাবেন যথেষ্ট।" এই লোভে শিক্ষিত বেকার মানুষটি ঝুঁকে পড়ে এই পেশায়, অন্যদিকে বিনামূল্যে শিক্ষক খাটিয়ে মোটা অংকের টাকা রোজগার করে যাচ্ছেন অধ্যক্ষ পদাধিকারিরা। ঢাকা শহরে দেখা যায় শতকরা ৯৫ ভাগ কেজি স্কুলই ভাড়া বাসায় চলছে। ৩/৫ হাজার টাকায় বাসা ভাড়া করে দিব্যি আয়াসে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিভাবকরা কেজি স্কুলে তার ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষার জন্যে পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন কারণে। তারা মনে করেন কেজি স্কুলে উন্নতমানের শিক্ষা দেয়া হয়। বিদেশি ইংরেজি বইসহ বিভিন্ন বই পড়ানো হয়। কেজি স্কুলে লেখা পড়া করে ছেলে-মেয়েরা মেধাবী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই সকল ছেলে মেয়ে অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কেজি স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে না জানলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে না। আমি পাঠকদের সামনে তা তুলে ধরছি। কেজি স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ আমি এ পর্যন্ত ঢাকা শহরের ১৫/১৬টি কেজি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে এবং ২টি কেজি স্কুলের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি তুলে ধরছি। কেজি স্কুলের ৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে ভর্তি করানো হয়। প্লে শ্রেণীতে ৪ বছর নার্সারী শ্রেণীতে ৫ বছর। কেজিওয়ান বা প্রথম শ্রেণীতে ৬ বছর-এভাবে পর্যায়ক্রমে ভর্তি করানো হয়। প্লে শ্রেণীতে ৮/১০টি বই পড়ানো হয়। এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, অংক, পরিবেশ পরিচিতি, অংকন উল্লেখযোগ্য। এই ছোট শিশু যে অক্ষরজ্ঞান জানে না তাকে শিক্ষা দেয়া হয় উপরোক্ত বিষয়সমূহ। তা ছাড়া ৮/১০টি বইয়ের সঙ্গে তাকে স্কুলে বহন করে নিতে হয় ব্যাগসহ ৮/১০টি খাতা, নোট বুক ইত্যাদি যা বাধ্যতামূলক। এতে দেখা যাচ্ছে উক্ত শিশুটি তার বইপত্র বহন করতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে তার ব্যাগ আনা-নেয়ার জন্যে অন্য একজনের প্রয়োজন হয়। ওই ব্যক্তিটি বাবা/মা বা অন্য কেউ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুল ভ্যান বা গাড়ির ব্যবস্থা থাকে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণীতে এসে বই খুলে নোট বুকে শুধু আগামী দিনের পড়াটা লিখে দেন। ৫০/৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর নোট বুক অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে লেখা সম্ভব হয় না। তা হলে শ্রেণীতে পড়াবে কি? এভাবে নোট বুকে লিখে দেবে কিন্তু বাসায় পড়াতে হবে অভিভাবকদেরকে। এভাবে প্রত্যেক শ্রেণীতে একই নিয়মে পড়ানো হয়। এতে দেখা যায় ওই ছাত্রের জন্যে বাসায় টিউটর রাখতে হবেই। তবে অন্য টিউটর হলে পরীক্ষায়, ক্লাসে খারাপ করবে। তাই বাধ্য হয়েই ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকই রাখতে হবে। এতে পরীক্ষা, শ্রেণীকক্ষে অধিক সুবিধা পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়ে তা হলে পরীক্ষায় খারাপ করে।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ কেজি স্কুলের পরীক্ষা পদ্ধতি একটু ভিন্নতর। মাসিক পরীক্ষা নেয়া হয়। এই মাসিক পরীক্ষার নম্বর পরবর্তী সাময়িক পরীক্ষায় যোগ হয়। মাসিক ও সকল পরীক্ষার প্রশ্ন করেন শিক্ষকরাই। হাতে লেখা প্রশ্ন হয় বেশির ভাগ কেজি স্কুলেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাইপ করে প্রশ্ন দেয়া হয়। এক এক বিদ্যালয়ে এক এক নিয়মে বেতন নেয়া হয়। তবে বেতন কমপক্ষে প্লে ৬০/৬৫ টাকা, নার্সারী ৬০/৭০ টাকা, ১ম শ্রেণী ৮০/৮৫ টাকা, ২য়-৮০/৮৫ টাকা, ৩য় ৯০/৯৫ টাকা ৫ম শ্রেণী ৯৫/১০০ টাকা, ... ৭০০/৮০০ টাকা মাসিক বেতনে বড় লোকদের ছেলে মেয়েদের স্কুলও আছে। বেতন ছাড়াও স্কুল ড্রেস, স্কুল খাতা, নোট বুক ইত্যাদি কিনতেই হবে। বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক স্কুল থেকে কিনতে হবে। অথচ সরকারি বই বিক্রির কোনো নিয়ম নেই। কয়েকটি বিদ্যালয়ে দেখলাম এ বছর বোর্ডের বই ৩০ টাকা সেটে বিক্রি করছে। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়। সরকার নাকি কেজি স্কুলে বই দেয় না, তাই অন্যান্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কিনে আনতে হয়। বিষয়টা কতটুকু সত্য তা কর্তৃপক্ষই ভালো জানেন।

কেজি স্কুলে ভর্তি ফি নেয়া হয় বিভিন্ন হারে। তবে প্লে শ্রেণীতে কমপক্ষে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা নেয়া হয়। বছর শেষে আবার প্রত্যেক শ্রেণী থেকে সেশন ফি বাবত ভর্তির সমান টাকা নেয়া হয়। শেষ কথা দেশের সব কেজি স্কুল যে খারাপ তা আমি বলছি না, শুধু হাতে গোনা কয়েকটি কেজি স্কুল ছাড়া বাকী সব এই আওতায় পড়বে। কেজি স্কুল নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই। তাই শিক্ষার নামে ব্যবসা চলছে সর্বত্র। সরকারকে এদিকে সুনজর দেয়া দরকার। তা না হলে শিশুরা শিক্ষার অভাবে তাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করবে। সরকারের পাশাপাশি অভিভাবককে সতর্ক হতে হবে ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার সন্তান কতটুকু শিক্ষা লাভ করেছে। আশা করি এ বিষয়ে সবাই মনোযোগী হবেন।

☐ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী